অধ্যায় ১২ : শিল্প তাৎপর্যের অভিনবত্ব ও মূল্যায়নঃ

মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য পথ হেঁটেছে, সাধনা করেছে। আজও সে তপস্যা সম্পূর্ণ হয় নি। গুহাবাসী মানুষের শিল্পসাধনা সংস্কৃত হতে হতে আজকের মানব সভ্যতায় নানা প্রয়োজন, সৌন্দর্যমূর্তিতে বিকশিত হয়েছে। শিল্প মানব সভ্যতা, মানব সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, ভরকেন্দ্র। লোকশিল্প লোকায়ত মানুষের সহজাত শিল্প। লোকায়ত মানুষের শুভ ইচ্ছা এবং অন্তরের আকাঙ্ক্ষার অভীপ্সা লোকশিল্প। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য ভারতীয় শিল্পের উত্তরাধিকারের ধারায় চিহ্নিত দিশাফলক। কবির কাব্যের শিল্প তাৎপর্য ব্যতিক্রমী অনুসন্ধানের খননক্ষেত্র। লোকশিল্পের উৎপত্তি সূত্রের ইতিহাস, ব্রাত্যশিল্পীর ইতিহাস, বাঙালি জাতি ও বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস নির্ণয় করতে হলে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। নিম্নবর্গীয় বৃত্তিজীবী মানুষই শিল্পী, সভ্যতার ধারক। বাস্তবনিষ্ঠ সমাজ সচেতন মুকুন্দরামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আলো ফেলে প্রান্তিক মানুষের শিল্পচর্চা ও জীবনচর্যার প্রতি অভিক্ষেপে। প্রজাবসতি, গ্রাম সমাজের পত্তন, জাতি, বৃত্তি এবং সম্প্রদায় নির্ভর পল্লীর লোকসমাজ যে লোকশিল্প সৃষ্টির আদর্শ ক্ষেত্র তা কবিকঙ্কণের কাব্যেই পূর্ণরূপে চিত্রিত। মধ্যযুগের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের থেকে কবিকঙ্কণের কাব্যের অন্যন্যতা এখানেই। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে কেসাই কামারের সৃষ্ট লোহার বাসরঘরের কথা আছে, আছে সনকা এবং বেহুলার চমৎকার রন্ধনপ্রণালীর চিত্র। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধবাদ্য এবং লোকবাদ্যের চমৎকার কাব্যব্যঞ্জনা আছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে লোকশিল্পকে কবি নিজস্ব স্টাইলে কাব্যে ব্যঞ্জিত করেছেন –

"অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।" [১]

রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে কৃষি নির্ভর পল্লী বাংলায় লোকায়ত শিল্প নানা তাৎপর্যে কাব্যরূপ পেয়েছে। তবুও অভিনব হয়ে উঠেছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। আরণ্যক সভ্যতার ক্রমপরিবর্তন গ্রাম এবং পল্লীতে, জাতি – বৃত্তি - সম্প্রদায় নির্ভর জনপদের পূর্ণরূপ তাঁর কাব্যেই ধরা পড়েছে। আর্য অনার্যের অভিঘাত, ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিতে সংঘাত – সমন্বয়, বাঙালির সংস্কার বিশ্বাস, রীতি-নীতি, মধ্যযুগের ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে প্রবহমান অভিজ্ঞতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে। জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় শিল্প তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যরূপ পেয়েছে। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের

মেলবন্ধন ঘটেছে তার কাব্যে। তাঁর কাব্য মঙ্গলকাব্যের শুধু গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি নয় - শিল্প, নৃতত্ত্ব, সমাজ, ইতিহাস, প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যা, ফোকলোর, মিথোলজি, সিম্বলস, সাহিত্য, সৌন্দর্যবোধ, মধ্যযুগীয় সময়পর্ব, সমাজ – অর্থনীতি এবং প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্য কবির কাব্যে কালের পালাবদলের স্তরে স্তরে বর্ণময় হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক পর্বান্তর, বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের সশব্দ সৃষ্টিমুখরতা কবির কাব্যে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক পরিখাকে ছাপিয়ে গেছে। বিশেষত, ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারে সংশ্লেষিত জাতি ও বৃত্তি বিভাজন সমাজ সংহতিতে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়েছিল। সম্প্রদায় অনুসারী বর্ণ ও কর্মবিভাগ একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য মানুষের কর্মমুখরতাকে থামিয়ে দিতে পারে নি। এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে কুমোর, কামার, ছুতোর, মালাকার প্রভৃতি লোকসম্প্রদায়ের শিল্পীর শিল্পকলার স্বতঃস্ফূর্ত রূপ ধরা পড়েছে কবির কাব্যে। চণ্ডীমঙ্গলের অনার্য মানুষের জীবন আখ্যান হল আখেটিক খণ্ড, আর আর্য অভিযানের উপাখ্যান বণিক খণ্ড। কালকেতু এবং ধনপতি দত্ত যথাক্রমে অনার্য এবং আর্য প্রতিনিধিদ্বয়। কালকেতু অরণ্য সংস্কার করে জনপদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৃত্তি এবং সম্প্রদায়পুষ্ট লোকসমাজের শেকড়বদ্ধ প্রয়োজন উন্মেচিত হয়েছে লোকশিল্পের উৎসমুখে। সৃষ্টি হয়েছে সংহত সমাজের শিল্প, জীবনের শিল্প, লোকশিল্প। এমন শিল্প লোকায়ত মানুষের শুধু প্রয়োজন পূরণ করে নি, তা নান্দনিক বিভাসের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। মধ্যযুগে যেখানে নারীর অবস্থান ছিল সংকুচিত, সেই সীমাবদ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও রমণীদের শিল্পকলার বর্ণময় উপস্থিতি দেখিয়েছেন কবিকঙ্কণ। লোকশিল্পীরা বংশ পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্যসূত্রে একই বৃত্তি গ্রহণ করে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। মুকুন্দরামের কাব্যে আছে এমন শিল্পের উৎসার। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পাশাপাশি ভাঁড়ু দত্ত এবং মুরারী শীলের মত কায়স্থতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধিদের চিহ্নিত করেছেন কবি। মুকুন্দরাম অন্যন্য। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও "মূর্খ বিপ্র" – এর উল্লেখ করতে ভোলেন নি কবি। শিল্পের সরণিতে মুকুন্দরামের সৃষ্টি ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকার। পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদে হাতির দাঁতের কাজ, ধাতবপাত্র, ধনু, রথ, বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র প্রভৃতি লোকশিল্পের উল্লেখ আছে। আর আমাদের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতে এমন লোকশিল্পের সম্ভার বিস্তৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে কালিদাসের কাব্যনাটকে লোকশিল্পের শীলিত রূপ উপস্থিত।

কালিদাস বিভিন্ন ঋতুতে ঋতুতে অলংকারের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। কালিদাস তাঁর "ঋতুসংহারম্" কাব্যে চৈত্রমাসে রমণীদের কটিদেশে "কনকময়ী কাঞ্চী" এবং

"স্তনমণ্ডলে হারযষ্টি ধারণের" উল্লেখ করেছেন। কামদেবের দর্পে তাদের অঙ্গযষ্টি শিথিল হয়ে পড়েছে। কালিদাস তাঁর "ঋতুসংহারম্" কাব্যে লিখেছেন –

"আলম্বিহেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ
কন্দর্পদর্পশিথিলীকৃতগাত্রষষ্ট্যঃ।" [২]

বেদের যুগের মহতী শিল্পের উত্তরণ ঘটেছিল পরবর্তীকালে। প্রাচীন বাংলায় নৌযান, জলচৌকি, মাটির খেলনা, অশ্বযানের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। চর্যাপদে বীণাযন্ত্র, মাদল এবং কুঁড়েঘরের দৃষ্টান্ত মেলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নৌকা, হারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণ দক্ষ নৌচালক ছিলেন। আর অন্ত্যমধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরাম ভারতীয় সাহিত্যের উত্তরাধিকার অর্জন করেছেন। তাঁর কাব্যে শুধু লোকশিল্পের উল্লেখ নয়, লোকশিল্পের উৎস – বিকাশ, শিল্পী ও শিল্পের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন সামান্য কলমের আঁচড়ে। লোকসমাজ অবস্থিত জাতি –বৃত্তি – সম্প্রদায় যে লোকশিল্প সৃষ্টির কারখানাঘর, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই সত্য নির্ণয় করা সম্ভব। আর এখানেই মুকুন্দরামের অনন্যতা। শুধু মধ্যযুগের সময় শাসনে মুকুন্দরামের অভিনবত্ব এবং মূল্যায়ন একান্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। লোকশিল্পের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপের পরিচয় নিতে হলে জাতি – বৃত্তি – সম্প্রদায় – শিল্প ও শিল্পীর শিল্পচর্চা আগামী গবেষকের কাছে দৃষ্টান্তযোগ্য গ্রন্থের ভূমিকা গ্রহণ করবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে লোকশিল্পের বিকাশের একটি মহেন্দ্রক্ষণ তাঁর কাব্যে উপস্থিত। স্বভাবতই মুকুন্দরামের কাব্যের অভিনবত্ব তাঁর কাব্যে উপস্থিত শিল্প সৌন্দর্যের সমগ্রতার উপরেই নির্ভর করবে। তার সৃষ্টির অন্যন্যতা, কাব্যে উল্লিখিত লোকশিল্পের মূল্যায়ন ভাল অথবা মন্দের হিসেবী বিতর্কের বাইরেই সম্ভব। মুকুন্দরাম অন্যন্য, অভিনব। নানা জাতি, সম্প্রদায় – শিল্পী ও শিল্পকে দেবদেবীর পুরাতনী উপাখ্যানের মধ্যে সাহিত্য ব্যঞ্জিত করে তিনি ভগীরথের মত গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছেন। তাঁর কাব্য শিল্প ব্যঞ্জিত, তাঁর শিল্প সাহিত্য ব্যঞ্জিত।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানবিক আবেদন বেশী। পুরাণ এবং ধর্ম থাকলেও সমাজ মনস্কতাই কাব্যের প্রাণ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যুগের ভাষ্য। যুগধর্ম বিশেষত জাতি, বৃত্তি, শিল্প – সংস্কৃতি সামাজিক প্রথা এবং সংস্কারের নির্মম নিরাসক্ত ভাষ্যকার মুকুন্দরাম। অনার্য মানুষের অস্বচ্ছলতা লক্ষণীয়। খুঞার বসন, পুরানো খোসলা অনার্য রমণী ফুল্লরা পরেছেন। পাশাপাশি প্রবঞ্চক ভাঁড়ু দত্ত, ঠক মুরারী শীলের থেকে কালকেতুর মত অনার্য ব্যাধের নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত। বণিক ধনপতি শখের পায়রা

ওড়ান। ভোগ সর্বস্ব জীবন – বিলাস, অকারণ প্রমোদ অন্তঃপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বণিক বধূ লহনা এবং খুল্লনা পরেছেন নানা অলংকার, পরেছেন পট্টবস্ত্র। সেকালের রমণীরা একালের মতই দুর্গাপূজায় নববস্ত্র পরতেন। তুলনায় অনার্য রমণী ফুল্লরার জীবনযাপন সহজ সরল। সামাজিক অবরোধ তার জীবনে ছিল না। তিনি মাংসের পসরা নিয়ে হাটে হাটে ফিরি করতেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে উৎপীড়িত অনিশ্চয়তা, তা সত্ত্বেও সেদিনের ধর্মপ্রাণ বাঙালি নমিত হয়েছেন মঙ্গলদেবীর পদতলে। পীড়িত দুঃখ দেবতার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। লোকায়ত মানুষ মর্যাদা পেয়েছে। তাদের শিল্প গৌরবের স্মারক হয়ে আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

বাংলার নানা স্থান নাম এবং দেবদেবীর মন্দিরের উল্লেখ আছে কাব্যে। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের উল্লেখ আছে কাব্যে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"গোকুলে গোমতী নামা তমুলোকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া"। [৩]

বর্গভীমা মন্দিরের শিল্প কারুকার্য আজো "কালের কপোলতলে" চিরন্তন হয়ে আছে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে বর্ণ – কর্ম – জাতি – সম্প্রদায় প্রবল ছিল। পদবী প্রথার উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে হলে লোকজীবনের শেকড় খোঁজার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কবিকঙ্কণ "পালধি" পদবির উৎপত্তির মূল প্রসঙ্গে লিখেছেন –

"ব্রাহ্মণ পালিতে তাঁকে বুদ্ধি দিল বিধি
সেই হইতে কুলে ওঝা হইল পালধি"। [৪]

কবিকঙ্কণের কাব্যে নারীর আত্মযন্ত্রণার ছবি ব্যক্ত হয়েছে। মধ্যযুগে নারীর পতিনিন্দার মধ্য থেকে অব্যক্ত কামনা বাসনার প্রকাশ ঘটেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি"। [৫]

মধ্যযুগের চিত্রকলায় পুরাণ প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাষাণে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ তো বটেই, পূজার পদ্ধতি লিখনের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে কবিকঙ্কণের কাব্যে – "পাষাণে নিশান লিখে পূজার পদ্ধতি"। [৬]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে "চামুরী"সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে –

"নিজোজি তোমারে আমি শুনহ চামুরি তুমি
চামর ঢুলাবে রাজ - অঙ্গে"। [৭]

মধ্যযুগে শীলিত জীবনবোধের নানা খণ্ডচিত্র সমগ্র চণ্ডীমঙ্গলের পাতায় পাতায় পাওয়া যাচ্ছে। সাধভক্ষণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হত।

মধ্যযুগের প্রচলিত নানা রীতি-নীতি, প্রথা পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গল অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রীতি বিদ্যমান ছিল। যাত্রাকালে শুভাশুভাবোধ এবং মঙ্গল – অমঙ্গলের ধারণা সমাজে বদ্ধমূল ছিল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"দক্ষিণে গণিকা দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বাঁয়ে শিবা পূর্ণ ঘটে জল।" [৮]

শিকারে যাওয়ার সময় কালকেতু কাঞ্চন গোধিকা দেখেছেন। গোধিকা যাত্রাকালে অশুভ বলে বিবেচিত হত। মধ্যযুগে রমণীর কাঁচলিতে নানা পুরাণ চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। দেবী চণ্ডীর কাঁচলিতে বিষ্ণুর দশ অবতারের চিত্র উল্লিখিত হয়েছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে শীল এবং দত্ত উপাধিধারী কায়স্থদের মাংস ভক্ষণের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। কালকেতুর কাছ থেকে মাংস কিনে দাম না দেওয়ার মধ্য থেকে অনার্য মানুষকে ঠকানোর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। বণিক পত্নী বান্যানিও মিথ্যা কথা বলেছেন ----

"সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাতকপাড়া
কালি দিব মাংসের ধার।" [৯]

সেকালে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছিল না। খন্যে অর্থাৎ মাটির নিচে গুপ্তস্থানে টাকা পয়সা এবং স্বর্ণালংকার লুকিয়ে রাখা হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন----

"খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা।
অকপটে দিল ধন মু না কৈল বাঁকা"।। [১০]

মেঘ বর্ণনায় ভারতীয় উত্তরাধিকার বহন করেছেন কবিকঙ্কণ। কালিদাসের মতই কবিকঙ্কণ মেঘের জাতি গোত্র বর্ণনা করেছেন। দ্রোণ, পুষ্কর, আবর্ত, সংবর্ত প্রভৃতি মেঘের জাতির উল্লেখ করেছেন কবি। গ্রহবিপ্র, বৈদ্য, সন্ন্যাসী এবং জ্যোতিষীরা কবির কাব্যে পৃথক স্থান লাভ করেছে। সেকালের রায়বেঁশে নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন কবি। পাইক সৈন্যদের নৃত্যতাল কবির কাব্যে বিশেষ জায়গা নিয়েছে। লোকসমাজে নানা সামাজিক বিষয়কে কবি প্রবাদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিজয়হাটী, পাড়পুর, সাতগাঁ, বর্ধমান, গণপুর, সেয়াখ্যালা, কাষথি, ফথেপুর, পাঁচড়া, শান্তিপুর, গোলাহাট, শীতলপুর, হালিশহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, মদনপুর প্রভৃতি স্থান নামের উল্লেখ করেছেন কবি। কপালকুণ্ডলা নামটিও কবিকঙ্কণের কাব্যে মেলে---

"কালী কান্তি কপালিনি কপালকুণ্ডলা"। [১১]

ধর্মপ্রাণ মানুষ অসহ জীবন বিনষ্টির জন্য গঙ্গায় আত্মহত্যা (বালিঘট) করেছেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিকঙ্কণ লিখেছেন ----

"আসিআ তোমার নীরে বালিঘট করি মরে।
সেই বধ তোমায় লাগে"। [১২]

বণিক খণ্ডে গ্রহ-নক্ষত্র – তিথি শুভাশুভযোগ, পাঁজি, পুঁথি এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। বিবাহ আচারে সুতা-নাটাই প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য যৌতুক রূপে দেওয়া হত। বিবাহে ঘট স্থাপন, প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের লোকসমাজে মন্ত্রের ব্যবহার ছিল। লহনা সপত্নী খুল্লনার ক্ষতি সাধন করার জন্য মন্ত্রের ব্যবহার করেছেন। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিনী সপত্নীর ভূমিকায় তিনি স্বামী সাধু ধনপতি দত্তের অনুরাগিনী হতে চেয়েছেন। এজন্য মন্ত্রের প্রয়োগ করেছেন তিনি। মন্ত্রের ক্রিয়াকে সক্রিয় করার জন্য ঔষধি প্রস্তুত করা, উঠোনে পত্রিকার কলাগাছ অঙ্কন, আলপনা দেওয়া প্রভৃতি কাজ করেছেন লহনা। খুল্লনার রূপ নাশ করার জন্য এসব করেছেন তিনি। সমকাল কবির কলমে যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বণিক খণ্ডের অনেক অংশ জুড়ে আছে মন্ত্র প্রসঙ্গ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাস্যার মত খুল্লনার বারমাস্যার বর্ণনা করেছেন। বারমাস্যার বর্ণনায় মুকুন্দরাম মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মধ্যযুগে পাশাখেলার প্রচলন ছিল। অন্তঃপুর রমণীরাও পুরুষদের সঙ্গে পাশা খেলতেন। পাশাখেলায় মন্ত্র শক্তিকে কাজে লাগানো হত। সেকালে পুত্রকামনায় বাসরসজ্জার সময়ে শুভযোগ নির্ণয় করা হত।

মধ্যযুগে সতীত্ব পরীক্ষার জন্য একটি বিশেষ লোকসংস্কার প্রচলিত ছিল, তা হল নতুন কলসীতে বিষধর সাপ এবং আংটি রেখে দেওয়া। কলসীতে হাত দিয়ে সেই আংটি তুলে নিতে হয়। খুল্লনা কলসীতে হাত দিয়ে সাতবার আংটি তুলেছিলেন। সতীত্বের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এছাড়া খুল্লনাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। জতুগৃহ নির্মাণ করে আগুন জ্বালিয়ে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। খুল্লনা এমন কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন। সেকালে ধান মাপার জন্য আড়ার ব্যবহার করা হত। মধ্যযুগে বাণিজ্য বিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নৌশিল্প এইযুগে সর্বোচ্চ শিল্পরূপ লাভ করেছিল। ধনপতি দত্ত সুদূর দক্ষিণ সিংহলে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। বাণিজ্য বিনিময় ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছিল। এভাবে সে যুগে সংস্কৃতি বিনিময় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত। সন্তানহীনা নারীদের সেকালে বাঁজা বলা হত। সমাজে তাদের নানা অপমান সহ্য করতে হত। লহনাকে এমন অপমানের আত্মযন্ত্রণা বহন করতে হয়েছে। সামাজিক রীতি – সংস্কারের সঙ্গে লোকশিল্প অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। সমাজ যেমন সাহিত্যে প্রতিফলিত, ঠিক

তেমনি লোকশিল্প সাহিত্য সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ একক। মুকুন্দরামের কাব্যে লোকশিল্প সাহিত্যকে ব্যঞ্জিত করেছে।

বেদের যুগেই গো - যানের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় বেদের যুগেই পরিলক্ষিত হয়। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত তাঁর "প্রাচীন ভারতের পথ – পরিচয়" গ্রন্থে লিখেছেন-

"আর্যরা গো-পালন করিতেন। গো-শকটে বলিবর্দ ব্যবহৃত হইত। গমনাগমনের জন্য রথ ও উহা টানিবার জন্য অশ্ব ব্যবহৃত হইত। [. . . .] ছুতারেরা যুদ্ধ অথবা মৃগয়ার জন্য রথ, শকট প্রভৃতি প্রস্তুত ব্যতীত নানারূপ কাঠ খোদাইয়ের কাজ করিত। কর্মকার বা কামারেরা লৌহ গলাইয়া নানারূপ পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। স্বর্ণকার নদীগর্ভ ও ভূমধ্যস্থ স্বর্ণ আহরণ করিয়া নানারূপ অলংকার নির্মাণ করিত। চর্মকার চর্মদ্বারা ধনুকের ছিলা, অশ্বের বলগা ও রথে ব্যবহার্য চামড়ার সরঞ্জাম প্রস্তুত করিত। তন্তুবায়ের কাজ ছিল বস্ত্র বয়ন।" [১৩]

বাংলাদেশের নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য লোকশিল্পীরা ছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির হৃদস্পন্দন। মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস, শিল্পের ইতিহাস সভ্যতার দীর্ঘ পথশ্রমের ফল। শিল্পিত স্বভাবের ব্রাত্য শিল্পীরা নানা মোটিফ, প্রতীক, সিম্বল, পুরাণ, দেববাদ সংস্কার বিশ্বাসকে মান্যতা দিয়েই শিল্প সৃষ্টি করেছেন। কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য শিল্পের অন্তর্লোকের অনুধ্যান। সুতরাং মুকুন্দরামের কাব্যে উল্লিখিত লোকশিল্পের মূল্যায়ন ভারতীয় শিল্পের বৃহত্তর মহত্তর পটভূমিকায়। A. L. Basham –এর উক্তি দিয়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনার উপসংহার করছি। A. L. Basham তাঁর "The wonder that was India" গ্রন্থের "The Arts" অধ্যায়ের "The Spirit of Indian Art" অংশে লিখেছেন –

"NEARLY all the artistic remains of ancient India are of a religious nature or were at least made for religious purposes [. . . .] Ancient India's religious art differs strikingly from her religious literature. The latter is the work of men with vocations, Brahmans, monks and asceties. The former came chiefly from the hands of secular craftsmen, who, though they worked according to priestly instructions and increasingly rigid iconographical rules, loved the

world they knew with an intensity which is usually to be seen behind the religious forms in which they expressed themselves". [১৪]

তথ্যসূত্র

১. ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, শম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় – সাহিত্য - পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ১৭২

২. কালিদাস, ঋতুসংহারম্, কালিদাসের রচনাবলী, সম্পা. – শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, ১৪২৬ (২০১৯), পৃ. ৫৩৯

৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সম্পা. – সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৩, পৃ. ৫

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১৩. সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল, প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৮

১৪. Basham, A. L. , The wonder that was India, Picador, London, 2004, PP. 348, 349